আস্ সফ্

৬১

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হয়ার সময়–কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দু'টি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কোন্ স্থানে কাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরন থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট–যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির

লোকদের মেজাজের ধরন–প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষণীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা–সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তাহলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পর ঈমান আনো এবং জান–মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য–সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য–সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।[২] *আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।*[৩]

১. এটা এই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদের তাফসীর, টীকা ১ ও ২। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী। তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক উর্ধে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন, সত্যকে উন্নতশির করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

২. একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এ ছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে

এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎসাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা) ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ)

اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ (بخارى ، مسلم)

"মুনাফিকের পরিচয় বা চিহ্ন তিনটি (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে)। তাহলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا؛ اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى، مسلم)

"চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া–বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দীনদারীর সীমালংঘন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহর কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করা অবশ্য কতর্ব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়া বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ, যে জন্য এ ক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতটিকে

এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগিশদের তিরস্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলে ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেন ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হচ্ছে না (যার মধ্যে যুদ্ধের হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ' পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে যেসব দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে, আয়াতগুলোর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে মুফাস্সিরগণ তার বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলত ঃ হায়! আল্লাহ তা'আলার কাছে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই কাজটি হলো জিহাদ, তখন নিজেদের কথা রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে এসব লোক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তারা নবীকে (সা) ফেলে রেখে জান নিয়ে পালিয়েছিল। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ বহু লোক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে আশ্বাস দিত যে, আপনাকে যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় তাহলে আমরা আপনার সাথে থাকব। কিন্তু শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় আসলে তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হত। কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন ঃ কোন কোন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত ঠিকই, কিন্তু তারা কোন কাজই করত না। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বড় গলায় বলত ঃ আমি এভাবে লড়াই করেছি, আমি এভাবে হত্যা করেছি। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

৩. এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা 'ফী

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾

তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন। "হে আমার কওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল।[৪] এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না।[৫]

সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না। দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত। এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবে ঃ

—আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

—পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

—নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।

—উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর

শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্টই ছিল তার ভিত্তি।

৪. কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি স্থানে অতি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে আল্লাহর নবী এবং তাদের পরম কল্যাণকামী হিসেবে জানার পরও বনী ইসরাঈল তাঁকে কতভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং কিভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৭ থেকে ৭১; আন নিসা, আয়াত ১৫৩; আল মায়েদা, আয়াত ২০ থেকে ২৬; আল আ'রাফ, আয়াত ১৩৮ থেকে ১৪১, ১৪৮ থেকে ১৫১; ত্বা হা, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৮। বাইবেলে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণিত ইতিহাসও এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। শুধু নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন, যাত্রা পুস্তক, ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২; ১৬ ঃ ২—৩; ১৭ ঃ ৩—৪; গণনাপুস্তক, ১১ঃ ১১—১৫; ১৪ ঃ ১—১০; ১৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ২০ ঃ ১-৫; কুরআন মজীদের এ স্থানটিতে এসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল জাতি তাদের নবীর সাথে যে আচরণ করেছিল তারা যেন তাদের নিজেদের নবীর সাথে ঐরূপ আচরণ না করে। অন্যথায় বনী ইসরাঈল যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল তারাও সেই একই পরিণামের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না।

৫. অর্থাৎ যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অযথা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freedom of choice) দিয়েছেন। এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দল ও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী এবং নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটা বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায়, বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

আর স্মরণ করো[৬] ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আমি সেই তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমার পূর্বে এসেছে[৭] এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।[৮]

কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করলেন তখন তারা বলল ঃ এটা তো স্পষ্ট প্রতারণা।[৯]

লাভ করবে। আর যখন সে মন্দ ও পাপ কাজের 'তাওফীক' লাভ করে তখন তার মন–মানসিকতার গোটা ছাঁচ এবং চেষ্টা–সাধনা ও কাজকর্মের পথও বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। এমন কি ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ধীরে ধীরে তার মধ্য থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। "তারা বাঁকা পথ ধরলে আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন" কথাটির অর্থ এটাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজে গোমরাহী কামনা করে গোমরাহীর জন্য তৎপর থাকে এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত থেকে অধিকতর গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমস্ত চিন্তা–ভাবনা ও চেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করে তাকে জোর করে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহর আইন ও নিয়ম–নীতির পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ যে পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় বাছাইয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এরূপ কাজ সেই উদ্দেশ্য লক্ষকেই নস্যাত করে দেবে। আর এভাবে হিদায়াত লাভ করে মানুষ সঠিক পথে চললেও সে জন্য তার কোন প্রকার বিনিময় বা উত্তম প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ারও যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এ ক্ষেত্রে তো বরং যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক হিদায়াত লাভ করেনি এবং গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তারও কোন প্রকার শাস্তি লাভ না করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় তার গোমরাহীর মধ্যে থেকে যাওয়ার সমস্ত দায়–দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তায়। সে বরং আখেরাতে জবাবদিহির সময় এ যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আপনার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত দান করার ব্যবস্থা যখন ছিল তখন আপনি আমাকে এই কৃপা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন কেন? 'আল্লাহ তা'আলা ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না' বাণীটির তাৎপর্য এটাই। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিজেরাই তাদের জন্য গোনাহ ও নাফরমানীর পথ বেছে নিয়েছে তিনি তাদেরকে আনুগত্যের পথে চলার 'তাওফীক' দেন না।

৬. এটা বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বারের নাফরমানির কথা। তারা একটি নাফরমানি করেছিল তাদের উত্থান যুগের শুরুতে। আর এটি হলো তাদের দ্বিতীয়

নাফরমানি যা তারা এই যুগেরই শেষ দিকে, সর্বশেষ পর্যায়ে করেছিলো। এরপর চিরদিনের জন্য তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হলো। এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে আল্লাহর রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলের মত আচরণ করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

৭. এই আয়াতাংশের তিনটি অর্থ। আর এ তিনটি অর্থই যথাযথ ও সঠিক।

এর একটি অর্থ হলো, আমি কোন স্বতন্ত্র এবং অভিনব দীন বা জীবন বিধান নিয়ে আসিনি। বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে দীন এনেছিলেন আমিও সেই দীন এনেছি। আমি তাওরাতকে রহিত বা বাতিল করতে আসিনি বরং তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী হিসেবে এসেছি। আল্লাহর রসূলগণ যেমন চিরদিনই তাঁদের পূর্বের নবী–রসূলদের সত্য হওয়ার কথা ঘোষণা করে এসেছেন আমিও তেমনি পূর্ববর্তী নবী–রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করছি। তাই আমার রিসালাত মেনে নিতে দ্বিধা–সংকোচ করার কোন কারণ তোমাদের জন্য নেই।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমার আগমন সম্পর্কে তাওরাতে যেসব সুসংবাদ বিদ্যমান আমি তার বাস্তব রূপ। তাই তোমাদের কর্তব্য আমার বিরোধিতা না করে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যার আগমনের সুসংবাদ আগে দিয়েছিলেন তিনি এখন এসে গিয়েছেন।

আর এই আয়াতাংশকে পরবর্তী আয়াতাংশের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় আরেকটি অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাওরাতে আল্লাহর রসূল আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার সত্যতা ঘোষণা করছি এবং নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি। এই তৃতীয় অর্থ অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই বাণী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেয়া সেই সুসংবাদের প্রতি ইংগিত যা তিনি তাঁর কওমের সামনে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন। তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের (সমাবেশ) দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮ ঃ শ্লোক—১৫ থেকে ১৯)

এটা তাওরাতের এমন একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ ভাষণে হযরত মূসা (আ) তাঁর কওমকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের

মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠাবো। একথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কোন কওমের 'ভাই' কথার অর্থ ঐ কওমেরই কোন গোত্র বা খান্দান হতে পারে না। বরং তার অর্থ কেবল এমন কোন জাতিই হতে পারে যার সাথে তার বংশগত নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। এর অর্থ যদি খোদ বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই কোন নবীর আগমন হতো তাহলে তার ভাষা হতো, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে নবী করে পাঠাব। অতএব বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থ অনিবার্যভাবে হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণই হতে পারে। আর হযরত ইবরাহীমের সন্তান হওয়ার কারণে হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরগণ তাদের বংশগত আত্মীয় হিসেবে গণ্য। তাছাড়া বনী ইসরাঈলের কোন নবী এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ হতে পারেন না। এর আরো একটি কারণ এই যে, হযরত মূসার পরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কোন একজন নবী নয় বরং বহু সংখক নবী এসেছেন বাইবেলে যার ভুরি ভুরি বর্ণনা রয়েছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, যাকে নবী বানিয়ে পাঠান হবে তিনি হবেন হযরত মূসার মত। এ কথা স্পষ্ট যে, এর অর্থ আকার-আকৃতি এবং জীবনের ঘটনাবলীর সাথে সাদৃশ্য মোটেই নয়। কারণ এ দিক দিয়ে বিচার করলে কোন ব্যক্তিই অপর কোন ব্যক্তির মত হয় না। আবার এর দ্বারা শুধু নবুওয়াতের গুণাবলীর দিক দিয়ে সাদৃশ্য বুঝায় না। কারণ হযরত মূসার পরে যত নবীর আগমন ঘটেছে তাঁদের সবারই নবীসুলভ গুণাবলী ছিল এক অভিন্ন। তাই কোন একজন নবীর এরূপ বৈশিষ্ট হতে পারে না যে, তিনি এই গুণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুরূপ হবেন। তাই এ দু'টি দিক দিয়ে সাদৃশ্য বাদ পড়ার পর অপর কোন সাদৃশ্য দ্বারা যদি আগমনকারী নবীকে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা বোধগম্য হতে পারে তবে সেই সাদৃশ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আগমনকারী নবী একটি স্বতন্ত্র শরীয়াত নিয়ে আসবেন। একমাত্র এদিক দিয়েই তিনি হতে পারেন হযরত মূসার অনুরূপ। আর এ বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবীর মধ্যে নেই। কারণ তাঁর আগে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন তাঁরা ছিলেন হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসারী। তাঁদের কেউ-ই স্বতন্ত্র কোন শরীয়াত নিয়ে আসেননি। ভবিষ্যদ্বাণীর নিম্নবর্ণিত বক্তব্য দ্বারা এ ব্যাখ্যা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঃ

"এটা তোমার (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) সেই প্রার্থনা অনুসারে হবে যা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সমাবেশের দিন হোরেবে করেছিলে, যেন আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে এবং এই মহাগ্নি আর দেখতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালই বলছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিব।"

এই বাক্যটির মধ্যে উল্লেখিত হোরেব অর্থ সেই পাহাড় হযরত মূসাকে প্রথমবার যেখানে শরীয়াতের আহকাম বা বিধিবিধান দেয়া হয়েছিল। আর এর মধ্যে বনী ইসরাঈলদের যে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে যদি আমাদেরকে কোন শরীয়াত দেয়া হয় তাহলে যেন সেই ভীতিকর অবস্থার মধ্যে না দেয়া হয়, যা শরীয়াত দেয়ার সময় হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কুরআন মজীদ ও

বাইবেল উভয় গ্রন্থে সেই সব অবস্থার উল্লেখ বিদ্যমান। (দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ৫৫, ৫৬, ৬৩; আল আ'রাফ, আয়াত ১৫৫, ১৭১; বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ১৯ ঃ ১৭, ১৮;) এর জবাবে হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে বলছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাদের জন্য এমন একজন নবী পাঠাবো, যার মুখে আমার কথা দিব। অর্থাৎ হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল পরবর্তী শরীয়াত দেয়ার সময় সেই অবস্থার সৃষ্টি করা হবে না। বরং এর পরে যে নবীকে এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তাঁর মুখে আল্লাহর বাণী দিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি আল্লাহর বান্দাদের তা শুনিয়ে দেবেন। এই স্পষ্ট কথাগুলো নিয়ে চিন্তা–ভাবনা ও বিচার–বিবেচনার পর এ ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকে যে, এ বাণীর বাস্তব রূপ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়? হযরত মূসার পরে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত কেবল তাঁকেই দেয়া হয়েছে। হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলের যেমন সমাবেশ হয়েছিল, তাঁকে শরীয়াত দেয়ার সময় এমন কোন সমাবেশ হয়নি এবং শরীয়াতের বিধিবিধান দেয়ার সময় কোন ক্ষেত্রেই সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়নি যা সেখানে করা হয়েছিল।

৮. এটি কুরআন মজীদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ইসলাম বিরোধীরা এ আয়াত নিয়ে যেমন অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে তেমনি জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধও করেছে। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

এক ঃ এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম বলা হয়েছে 'আহমাদ'। আহমাদ শব্দের দু'টি অর্থ। এক, আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। দুই, সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত অথবা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসার যোগ্য। সহীহ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নাম। মুসলিম ও আবু দাউদ তায়ালিসীতে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্মাদ এবং আমি সমবেতকারী....................হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম থেকে ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী এবং নাসায়ী একই বক্তব্য সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নামটি সাহাবীদের মধ্যেও পরিচিত ছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতার একটি ছত্রে বলা হয়েছে ঃ

صَلَّى الْإِلٰهُ وَمَنْ نَحِفُّ بِعَرْشِهِ ، وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحْمَدَ

মহান আল্লাহ, তাঁর আরশের চারপাশে সমবেত ফেরেশতারা এবং সব পবিত্র সত্তা বরকত ও কল্যাণময় আহমাদের ওপর দরূদ পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুধু মুহাম্মাদ ছিল না বরং আহমাদও ছিল। আরবদের গোটা সাহিত্যে কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, নবীর (সা) পূর্বে কারো নাম আহমাদ রাখা হয়েছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এত অধিক সংখ্যক লোকের নাম আহমাদ ও গোলাম আহমাদ রাখা হয়েছে যে, তা হিসেব করাও অসম্ভব। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, নবুওয়াতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মাতের মধ্যে তাঁর এই পবিত্র নামটি সুপরিচিত ও সুবিদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম যদি আহমাদ না হয়ে থাকে তাহলে যারা তাদের ছেলেদের নাম গোলাম আহমাদ রেখেছে তারা তাদের ছেলেদেরকে কোন্ আহমাদের গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল?

দুই ঃ যোহন লিখিত সুসমাচারে সাক্ষ দেয় যে, হযরত ঈসা মাসীহর আগমনের সময় বনী ইসরাঈল জাতি তিনজন মহাব্যক্তিত্বের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। এক, মাসীহ, দুই, এলিয় (অর্থাৎ হযরত ইলিয়াসের পুনরায় আগমন) এবং তিন, "সেই নবী"। যোহনের সুসমাচারের ভাষা হলো ঃ

"আর যোহনের (হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) সাক্ষ্য এই,—যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর" .... তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? (অধ্যায়—১, পদ ১৯ থেকে ২৫)

এসব কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা মাসীহ এবং হযরত ইলিয়াস ছাড়াও আরো একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। হযরত ইয়াহইয়া সেই নবী ছিলেন না। সেই নবীর আগমন সম্পর্কে আকীদা–বিশ্বাস বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এতটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ছিল যে, তাঁকে বুঝানোর জন্য 'সেই নবী' কথাটা বলাই যেন যথেষ্ট ছিল। পুনরায় একথা বলার আর প্রয়োজনই হতো না যে, তাওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এসব কথা থেকে এও জানা গেল যে, তিনি যে নবীর প্রতি ইংগিত করছিলেন তাঁর আগমনের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহইয়াকে যখন বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি একথা বলেননি যে, তোমরা কোন্ নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ, আর কোন নবী তো আসেবন না?

তিন ঃ এবার সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একটু লক্ষ করুন যা যোহনের সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত অধ্যায়ে একাধারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা সে তাঁহাকে দেখেনা, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন" (১৪ঃ ১৬, ১৭)

"তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এইসকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৪ ঃ ২৫, ২৬)

"এর পর আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।" (১৪ ঃ ৩০)

"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" (১৫ ঃ ২৬)

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (১৬ ঃ ৭)

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।" (১৬ ঃ ১২–১৫)

চার ঃ বাইবেলের এসব উদ্ধৃতির সঠিক অর্থ নিরূপণের জন্য সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সমকালীন ফিলিস্তিনবাসীদের ভাষা ছিল আরামীয় ভাষার সেই কথ্য রূপ যাকে সুরিয়ানী (SYRIAC প্রাচীন সিরীয় ভাষা) বলা হয়। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের দুই আড়াই শত বছর পূর্বেই সালুকী (Seleucide) শাসন আমলে এ অঞ্চল থেকে ইব্রিয় বা হিব্রু ভাষা বিদায় নিয়েছিল এবং সুরিয়ানী ভাষা তার স্থান দখল করেছিল। যদিও প্রথমে সালুকী এবং পরে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে গ্রীক ভাষাও এ অঞ্চলে পৌঁছেছিল কিন্তু যে শ্রেণীটি সরকার ও রাজদরবারে স্থান করে নিয়েছিল কিংবা স্থান করে নেয়ার জন্য গ্রীক ভাবধারা পন্থী হয়ে গিয়েছিল কেবল তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ সুরিয়ানী ভাষার একটি বিশেষ কথ্য রূপ (Dialect) ব্যবহার করত যার ধ্বনি, কথনভঙ্গি, উচ্চারণরীতি এবং বাকধারা দামেশক অঞ্চলে প্রচলিত সুরিয়ানী ভাষারূপ থেকে ভিন্ন ছিল এবং এ দেশের সাধারণ মানুষ গ্রীক ভাষার সাথে এতটা অপরিচিত ছিল যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে যিরুশালেম দখলের পর রোমান জেনারেল টিটুস (Titus) যিরুশালেমের অধিবাসীদের সামনে গ্রীক ভাষায় বক্তৃতা করলে তা সুরিয়ানী ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছিল। এ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শাগরিদদের যা বলেছিলেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষায় হবে।

দ্বিতীয় যে, বিষয়টি জানা জরুরী তা এই যে, বাইবেলের চারটি পুস্তক বা সুসমাচারই সেই সব গ্রীক ভাষাভাষী খৃষ্টানদের লেখা যারা হযরত ঈসার পর এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ তাদের কাছে সুরিয়ানী ভাষী কোন খৃষ্টানের মাধ্যমে লিখিত আকারে নয় বরং মৌখিক বর্ণনার আকারে পৌঁছেছিল এবং সুরিয়ানী ভাষার এই বর্ণনাসমূহকে তারা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ করেছিল। এসব পুস্তক বা সুসমাচারের কোনটিই ৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত নয়। আর যোহন লিখিত সুসমাচার তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একশত বছর পরে সম্ভবত এশিয়া মাইনরের এফ্‌সুস শহরে বসে লেখা। তাছাড়াও গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচারের মূল কোন কপিও সংরক্ষিত নাই। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত যেসব পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে একত্রিত করা হয়েছিল তার কোনটিই চতুর্থ শতাব্দির পূর্বের নয়। তাই তিন শতাব্দীকাল সময়ে এসবের মধ্যে কি কি রদবদল এবং পরিবর্তন–পরিবর্ধন হয়েছে তা বলা মুশকিল। যে জিনিস এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে সন্দেহজনক করে তোলে তা হলো, খৃষ্টানরা তাদের পছন্দ মাফিক জেনে বুঝে তাদের সুসমাচারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বৈধ মনে করে এসেছে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৪৬ সনের সংস্করণে) এর বাইবেল শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধের রচয়িতা লিখছেন ঃ

"বাইবেলের সুসমাচারসমূহে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য যা পদকেই অন্য কোন সূত্র থেকে এনে গ্রন্থের মধ্যে শামিল করার মত সুস্পষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে জেনে শুনে। ....স্পষ্টত উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তা করেছে এমন সব লোক যারা মূল গ্রন্থে অন্তরভুক্ত করার জন্য কোন জায়গা থেকে কিছু তথ্য লাভ করেছে এবং গ্রন্থকে উন্নত ও অধিক কল্যাণকর বানানোর জন্য নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে সেই সব তথ্য শামিল করার অধিকারী বলে নিজেদেরকে মনে করেছে................এরূপ বহুসংখ্যক সংযোজন দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল। কিন্তু তার উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি।"

বর্তমানে বাইবেলের সুসমাচারসমূহে আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব বাণী দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং তাতে কোন রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়নি এমন কথা বলা উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত কঠিন।

তৃতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলমানদের বিজয়ের পরেও প্রায় তিন শতাব্দীকাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃষ্টান অধিবাসীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী এবং খৃষ্টীয় নবম শতকে গিয়ে আরবী ভাষা সে স্থান দখল করে। সুরিয়ানী ভাষাভাষী ফিলিস্তিনবাসীদের মাধ্যমে খৃষ্টীয় ঐতিহ্য বা ধর্মাচরণ, আচার–অনুষ্ঠান ও ইতিহাস সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলিম মনীষীগণ লাভ করেছিলেন তা সেই সব লোকদের লব্ধ তথ্যের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত যা তাদের কাছে সুরিয়ানী থেকে গ্রীক এবং গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের পর অনুবাদ হয়ে পৌঁছেছিল। কেননা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুখ থেকে উচ্চারিত মূল সুরিয়ানী শব্দসমূহ মুসলিম মনীষীদের কাছে সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।

পাঁচ ঃ অনস্বীকার্য এসব ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি লক্ষ করে দেখুন ওপরে উদ্ধৃত যোহন লিখিত সুসমাচারের পদগুলোতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এমন একজন আগমনকারীর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছেন যিনি তাঁর পরে আসবেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলছেন ঃ তিনি হবেন গোটা বিশ্বের নেতা (সরওয়ারে আলম), চিরকাল থাকবেন, সত্যের সবগুলো পথ দেখাবেন এবং নিজে তাঁর (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন। যোহন লিখিত সুসমাচারের এসব বাক্যের মধ্যে "পবিত্র আত্মা" এবং "সত্যের আত্মা" ইত্যাদি কথাগুলো অন্তরভুক্ত করে মূল বিষয় ও বক্তব্যকে বিকৃত করার পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীর মনোযোগ সহকারে বাক্যগুলো পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে আগমনকারীর আগমনের কথা বলা হয়েছে তিনি কোন আত্মা নন বরং মানুষ। তিনি এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁর শিক্ষা হবে বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেই বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদে 'সহায়' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যোহন লিখিত মূল সুসমাচারে গ্রীক ভাষার যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল সে ব্যাপারে খৃস্টানদের অনড় দাবী হচ্ছে, যে শব্দটি ছিল Paracletis কিন্তু শব্দটির অর্থ নিরূপণে খোদ খৃস্টান পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট জটীলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclet শব্দটির কয়েকটি অর্থ হয়। কোন স্থানের দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, ভীতি প্রদর্শন করা, সাবধান করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা বা আবেদন নিবেদন করা এবং দোয়া করা। তাছাড়াও গ্রীক বাগবিধি অনুসারে শব্দটির অর্থ হয় সান্ত্বনা দেয়া, পরিতৃপ্ত করা, সাহস যোগানো। বাইবেলের যেসব জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব জায়গায় এর কোন একটি অর্থও খাপ খায় না। ওরাইজেন (Origen) কোথাও এর অনুবাদ করেছেন Consolator আবার কোথাও অনুবাদ করেছেন Deprecator। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এ দু'টি অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা, প্রথমত গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে এটি শুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত সবগুলো বাক্যের যেখানে যেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এ অর্থ খাপ খায় না। আরো কিছু সংখ্যক অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন Teacher. কিন্তু গ্রীক ভাষার ব্যবহার রীতি অনুসারে এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে না। এর অনুবাদে তার তুলিয়ান এবং অগাষ্টাইন Advocate শব্দটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আরো কিছু সংখ্যক লোক Assistant, Camforter এবং Consoler ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ—প্যারাক্লিটাস)।

এখন মজার ব্যাপার হলো, গ্রীক ভাষাতেই অন্য একটি শব্দ আছে Periclytos.যার অর্থ প্রশংসিত। এ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে محمد শব্দের সমার্থক। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও Periclytos এবং Paracleteus এর মধ্যে বেশ মিল আছে। অসম্ভব নয় যে, যেসব খৃস্টান মহাত্মনরা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে নিজেদের মর্জি ও পছন্দ মাফিক নির্দ্বিধায় পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে অভ্যস্ত ছিলেন তারা যোহন কর্তৃক বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দটিকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী দেখতে পেয়ে তা লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুটা রদবদল করে দিয়েছে। এ বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য যোহন কর্তৃক লিখিত আদি গ্রীক ভাষার সুসমাচার গ্রন্থ কোথাও বর্তমান নেই। তাই দু'টি শব্দের মধ্যে মূলত কোন্‌টি ব্যবহার করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করে দেখার সুযোগ নেই।

ছয় ঃ কিন্তু যোহন কোন্ গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার ওপরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভর করে না। কেননা তাও অনুবাদ। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফিলিস্তিনের সুরিয়ানী ভাষা ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা। তাই তিনি তাঁর সুসংবাদ বাণীতে যে শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষারই কোন শব্দ হবে। সৌভাগ্যবশত আমরা সুরিয়ানী ভাষার সেই মূল শব্দটি পাচ্ছি ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থে এবং তার সমার্থক গ্রীক শব্দটি কি তাও সাথে সাথে ঐ একই গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম ইউহান্নাস (যোহন)–এর সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৭ পদ এবং ১৬ অধ্যায়ের পুরো অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে গ্রীক ভাষার "فارقليط" শব্দের জায়গায় সুরিয়ারী ভাষার منحمنا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অতপর ইবনে ইসহাক অথবা ইবনে হিশাম এভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মুন্‌হামান্না (منحمنا) শব্দের অর্থ সুরিয়ানী ভাষায় মুহাম্মাদ এবং গ্রীক ভাষায় বারকালীতুস (برقليطس) হয়। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)।

এখন দেখুন, ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এ অঞ্চল ইসলামবিজিত অঞ্চলের অন্তরভুক্ত ছিল। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং ইবনে হিশাম ৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। এর অর্থ হলো, তাঁদের উভয়ের যুগেই ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলত। আর ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের জন্য তাঁদের নিজ দেশের খৃষ্টান নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন মোটেই কোন কঠিন বিষয় ছিল না। তা ছাড়াও সে সময় লক্ষ লক্ষ গ্রীক ভাষী খৃষ্টান ইসলামী ভূখণ্ডে বসবাস করত। তাই সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দ গ্রীক ভাষার কোন্ শব্দের সমর্থক তা জেনে নেয়াও তাঁদের জন্য কঠিন ছিল না। এখন কথা হলো, ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃত অনুবাদে যদি সুরিয়ানী শব্দ منحمنا (মুনহামান্না) ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর ইবনে ইসহাক বা ইবনে হিশাম যদি তার ব্যাখ্যা এই করে থাকেন যে, আরবী ভাষায় তার সমার্থক শব্দ "মুহাম্মাদ" এবং গ্রীক ভাষায় "বারকালীতুস" তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই আর থাকে না যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম নিয়েই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে একথাও জানা যায় যে, যোহন কর্তৃক গ্রীক ভাষায় লিখিত সুসমাচারে মূলত Periclytos শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে খৃষ্টানরা পরিবর্তন করে Paracletus বানিয়ে দিয়েছে।

সাত ঃ এর চেয়েও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন, নাজ্জাশী যখন তাঁর দেশ হাবশায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে শুনলেন তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ الَّذِىْ نَجِدُ فِى الْاِنْجِيْلِ وَاَنَّهُ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهٖ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ (مسند احمد)

"স্বাগত জানাই তোমাদেরকে আর স্বাগত জানাই তাঁকেও যার নিকট থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রসূল। আর তিনিই সেই সত্তা যাঁর উল্লেখ আমরা ইনজীলে দেখতে পাই এবং তিনিই সেই সত্তা যার সুসংবাদ ঈসা ইবনে মারয়াম দিয়েছিলেন।"

বিভিন্ন হাদীসে এ কাহিনী খোদ হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নাজ্জাশী জানতেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বরং একথাও প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচারে সেই নবীর এমন সব সুস্পষ্ট লক্ষণাদিরও উল্লেখ ছিল যার ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে সেই নবী সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নজ্জাশী একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এ সুসংবাদ সম্পর্কে নাজ্জাশীর জ্ঞানের সূত্র ও উৎসে যোহন লিখিত এই সুসমাচার ছিল, না অন্য আর কোন উৎসে ও সূত্র সে সময় বর্তমান ছিল, এ বর্ণনা থেকে তা জানা যায় না।

আট ঃ সত্য কথা হলো, খৃস্টান গীর্জাসমূহ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য ও সর্বসমর্থিত (Canonical Gospels) বলে ঘোষিত চারখানি সুসমাচার যে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই হযরত ঈসার (আ) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ জানার নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে না, তাই নয়, বরং তা খোদ হযরত ঈসার (আ) নিজের সঠিক জীবন বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ারও নির্ভরযোগ্য উৎস নয়। বরং তা জানার অধিক নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে বার্নাবাসের সেই সুসমাচার যাকে গীর্জাসমূহ বেআইনী ও অনির্ভরযোগ্য (Apocryphal) বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। খৃস্টানরা তা গোপন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। শত শত বছর পর্যন্ত তা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রাখা হয়েছিল। ইটালীয় ভাষায় অনূদিত এর একটি মাত্র কপি ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ সিক্সটাসের (Sixtus) লাইব্রেরীতে পাওয়া যেত। কিন্তু তা পড়ার অনুমতি কারো ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে তা জন টোলেন্ড নামক এক ব্যক্তির হাতে আসে। অতপর বিভিন্ন হাত ঘুরে ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে তা ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অক্সফোর্ডের ক্লেরিন্ডন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সম্ভবত খৃস্টান জগত আচ করতে পারে যে, যে ধর্মকে হযরত ঈসার নামে নামকরণ করা হয় এ গ্রন্থ তারই মূলোৎপাটন করছে। তাই এর মুদ্রিত কপিসমূহ বিশেষ কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উধাও করে দেয়া হয়। এরপর তা আর কখনো প্রকাশিত হতে পারেনি। এ গ্রন্থেরই ইটালিয়ান ভাষার অনুবাদ থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত আরেকটি কপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যেত। জর্জ সেল তাঁর কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটাও কোথাও গায়েব করে দেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের একটি ফটোষ্ট্যাট কপি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি

এর প্রতিটি শব্দ পড়েছি। আমার মনে হয়, এটা অতি বড় একটা নিয়ামত। খৃষ্টানরা কেবল হিংসা–বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে এর থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

খৃষ্টীয় সাহিত্যে যেখানেই এই ইনজিল বা সুসমাচারের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানেই একথা বলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, এটা কোন মুসলমানের রচিত নকল সুসমাচার যা বার্নাবাসের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। এত বড় একটা মিথ্যা বলার কারণ এই যে, এ গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে স্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। প্রথমত এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থ কোন মুসলমানের রচনা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ গ্রন্থ যদি কোন মুসলমানের রচিত হতো তাহলে মুসলমানদের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত এবং মুসলিম মনীষী ও পন্ডিতদের রচনায় ব্যাপকভাবে এর উল্লেখ থাকত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো জর্জ সেলের কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার পূর্বে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই মুসলমানদের আদৌ জানা ছিল না। তাবারয়ী, ইয়া'কূবী, মাস'উদী, আল বিরুনী ও ইবনে হাযম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ ছিলেন খৃষ্টীয় সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী মুসলিম মনীষী। তাঁদের কারো রচনাতেই খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় বার্নাবাসের সুসমাচারের আভাস–ইংগিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইসলামী বিশ্বের গ্রন্থাগারসমূহে যেসব গ্রন্থরাজি ছিল ইবনে নাদীম রচিত "আল ফিহরিস্ত" এবং হাজী খলীফা রচিত "কাশফুয্ যুনুন" গ্রন্থই তার ব্যাপক ও সর্বোত্তম তালিকা গ্রন্থ। এ দু'টি গ্রন্থেও তার কোন উল্লেখ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর আগে কোন মুসলমান পণ্ডিতই বার্নাবাসের সুসমাচারের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। একথাটি মিথ্যা হওয়ার তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মেরও ৭৫ বছর আগে পোপ প্রথম গ্লাসিয়াসের (Gelasius) যুগে খারাপ আকীদা ও বিভ্রান্তিকর (Heretical) গ্রন্থরাজির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং পোপের দেয়া একটি ফতোয়ার জোরে যা পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল তার মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচার (Evangelium Barnabe) গ্রন্থখানিও অন্তরভুক্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, তখন মুসলমান এসেছিল কোথা থেকে যে এই নকল ইনজীল বা সুসমাচার রচনা করেছিল? খোদ খৃষ্টান পণ্ডিত পুরোহিতগণও একথা স্বীকার করেছেন যে, সিরিয়া, স্পেন, মিসর প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান গীর্জাসমূহে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বার্নাবাসের সুসমাচার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নয় ঃ এই সুসমাচার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে হযরত ঈসার সুসংবাদসমূহ উদ্ধৃত করার আগে গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায় এবং একথাও জানা যায় যে, খৃষ্টানরা এর প্রতি এত মারমুখী কেন?

যে চারখানি সুসমাচারকে আইনসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে বাইবেলের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে তার কোনটিরই লেখক হযরত ঈসার সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা কেউ একথা দাবীও করেননি যে, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেসব উৎস থেকে তাঁরা তথ্য

গ্রহণ করেছেন তার কোন বরাতও তারা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁরা বরাত উল্লেখ করতেন তাহলে তা থেকে জানা যেতো যে, বর্ণনাকারী যেসব ঘটনা বর্ণনা করছেন এবং যেসব বাণী উদ্ধৃত করছেন তা তিনি নিজে দেখেছেন এবং শুনেছেন না একজন বা কয়েকজনের মাধ্যমে তা তাঁর কাছে পৌছেছে? পক্ষান্তরে বার্নাবাসের সুসমাচারের লেখক বলেছেন আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম বারজন হাওয়ারীর একজন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি হযরত ঈসা মাসীহর সাথে ছিলাম এবং নিজের চোখে দেখা ঘটনা এবং নিজের কানে শোনা বাণী এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করছি। শুধু এতটুকুই নয়, বরং গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে তিনি বলছেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় হযরত মাসীহ আমাকে বলেছিলেন ঃ আমার ব্যাপারে যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা বিদূরিত করা এবং দুনিয়ার সামনে সঠিক অবস্থা তুলে ধরা তোমার দায়িত্ব।

কে ছিলেন এই বার্নাবাস? বাইবেলের "প্রেরিতদের কার্য" পুস্তকে এই নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ বার বার এসেছে। এ ব্যক্তি ছিল সাইপ্রাসের এক ইহুদী পরিবারের লোক। খৃস্টান ধর্মের প্রচার এবং ঈসা মাসীহর অনুসারীদের সাহায্য–সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার সেবা ও অবদানের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু কখন সে মাসীহর ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা কোথাও বলা হয়নি এবং প্রাথমিক যুগের বারজন হাওয়ারীর যে তালিকা তিনটি সুসমাচারে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই। তাই উক্ত সুসমাচারের লেখক সেই বার্নাবাস নিজে না অন্য কেউ তা বলা কঠিন। মথি এবং মার্ক হাওয়ারীদের (Apostles) নামের যে তালিকা দিয়েছেন বার্নাবাসের দেয়া তালিকা শুধু দু'টি নামের ক্ষেত্রে তাদের থেকে ভিন্ন। ঐ দু'টি নামের একটি হলো 'তূমা'। এ নামটির পরিবর্তে বার্নাবাস নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো 'শামাউন কানানী'। এ নামটির পরিবর্তে তিনি ইয়াহুদা ইবনে ইয়া'কূবের নাম উল্লেখ করেছেন। লুক লিখিত সুসমাচারে এই দ্বিতীয় নামটিরও উল্লেখ আছে। তাই এরূপ ধারণা করা যুক্তিসংগত যে, পরবর্তীকালে কোন এক সময় শুধু বার্নাবাসকে হাওয়ারীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য তূমার নাম অন্তরভুক্ত করা হয়েছে যাতে তার সুসমাচার গ্রন্থের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর নিজেদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এ ধরনের রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেয়া ঐ সব মহাত্মনদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ ছিল না।

কেউ যদি বার্নাবাসের এই ইনজীল বা সুসমাচার গ্রন্থখানি পক্ষপাত শূন্য ও বিদ্বেষমুক্ত মনে চোখ খুলে পড়ে এবং বাইবেল নতুন নিয়মের চারখানি সুসমাচারের সাথে তার তুলনা করে তাহলে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, এই গ্রন্থখানি উক্ত চারখানি গ্রন্থের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের ঘটনাবলী অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন কেউ প্রকৃতপক্ষে সেখানকার সবকিছু দেখছিল এবং নিজেও তাতে শরীক ছিল। চারখানি সুসমাচারের অসংবদ্ধ ও খাপ ছাড়া কানিহীসমূহের তুলনায় এর ঐতিহাসিক বর্ণনা অধিক সুসংহত এবং ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতাও আরো ভালভাবে বোধগম্য। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষাসমূহ বাইবেলের চারখানি সুসমাচারের তুলনায় অধিক স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং মর্মস্পর্শীরূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে তাওহীদের শিক্ষা, শিরক খণ্ডন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, ইবাদাতের প্রাণসত্তা এবং উত্তম ও উন্নত চরিত্রের বিষয়াবলী

অত্যন্ত জোরালোভাবে, যুক্তি ও প্রমাণসহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেসব শিক্ষণীয় উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে মাসীহ আলাইহিস সালাম যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, চারখানি সুসমাচারে তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই। তিনি কি ধরনের বিজ্ঞোচিত পন্থায় তাঁর শাগরিদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন এ গ্রন্থ থেকে সে বিষয়টিও অধিক বিস্তারিতভাবে জানা যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা, বাচনভঙ্গি এবং মেজাজ প্রকৃতি সম্পর্কে যার সামান্য পরিমাণও জ্ঞান আছে সে এই সুমাচার গ্রন্থখানি পাঠ করলে একথা স্বীকার না করে পারবে না যে, এটা পরবর্তীকালে কারো রচিত কোন নকল কাহিনী নয়। বরং চারখানি সুসমাচারের তুলনায় এতে হযরত ঈসা তাঁর প্রকৃত মর্যাদায় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠেন। তাছাড়া সুসমাচার চতুষ্টয়ে তাঁর বিভিন্ন বাণীর মধ্যে যে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থে তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

হযরত ঈসার জীবন ও শিক্ষা হিসেবে এ গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক অর্থে একজন নবীর জীবন ও শিক্ষা বলেই মনে হয়। এতে তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবেই পেশ করেছেন। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী এবং আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। এতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নবী–রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) শিক্ষা ছাড়া সত্যকে জানার অন্য কোন মাধ্যম নেই। যারা নবী–রসূলদের পরিত্যাগ করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই পরিত্যাগ করে। সমস্ত নবী–রসূল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের যে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হুবহু সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি নামায, রোযা এবং যাকাতের শিক্ষা দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে বার্নাবাস বহুস্থানে তাদের নামাযের যে উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, এই ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময়ই তারা নামায পড়তেন এবং সর্বদা নামাযের আগে অযু করতেন। নবী–রসূলদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ ও সুলায়মানকেও তিনি নবী বলে স্বীকৃতি দিতেন। অথচ ইহুদী ও খৃস্টানরা তাঁদেরকে নবীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। তিনি হযরত ইসমাঈলকেই 'যাবীহ' (যাঁকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন—অনুবাদক) বলে ঘোষণা করেন, একজন ইহুদী আলেমকে তিনি স্বীকার করান যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন 'যাবীহ' কিন্তু বনী ইসরাঈলরা জোড়াতালি দিয়ে জোর করে হযরত ইসহাককে যাবীহ বানিয়ে রেখেছে। কুরআন মজীদে আখেরাত, কিয়ামত, জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তাঁর শিক্ষাও প্রায় তার কাছাকাছি।

দশ ঃ বার্নাবাসের সুসমাচারে বিভিন্নস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্ট সুসংবাদের উল্লেখ থাকার কারণে যে খৃস্টানরা এর বিরোধী তা নয়। কারণ নবীর (সা) জন্মেরও বহু আগে তারা এ গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের উষ্মা ও অসন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম যুগের অনুসারীগণ তাঁকে কেবল একজন নবী হিসেবে স্বীকার করতেন, হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসরণ করতেন, আকীদা–বিশ্বাস, হুকুম–আহকাম ও ইবাদাত–বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বনী ইসরাঈল জাতির অন্য সবার থেকে মোটেই আলাদা কিছু মনে করতেন না এবং ইহুদীদের সাথে তাদের বিরোধ

ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁরা হযরত ঈসাকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতো। পরবর্তীকালে সেন্টপল এই দলে শামিল হলে সে রোমান, গ্রীক এবং অন্যান্য অ-ইহুদী ও অ-ইসরাঈলী লোকদের মধ্যেও এ ধর্মের তাবলীগ ও প্রচার শুরু করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে সে একে এমন একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে ফেলে যার আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং হুকুম-আহকাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পেশকৃত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। এই ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহচর্য আদৌ পায়নি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় সে ছিল তার চরম বিরোধী এবং তাঁর পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত সে তাঁর অনুসারীদের চরম শত্রু ছিল। পরবর্তী সময়ে এই দলে শামিল হয়ে যখন সে একটি নতুন ধর্ম তৈরী করতে শুরু করে তখনও সে তার এ কাজের সমর্থনে হযরত ঈসার দেয়া কোন সনদ পেশ করেননি বরং নিজের 'কাশ্ফ' ও 'ইলহাম' বা মনের স্বতঃস্ফূর্ত সৎপ্রেরণার ভিত্তিতেই তা করেছে। নতুন এই ধর্ম রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম হবে এমন যা দুনিয়ার সমস্ত অ-ইহুদী (Gentile) গ্রহণ করবে। সে ঘোষণা করলো, খৃষ্টানরা ইহুদীদের শরীয়াতের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বাধ্য বাধকতা থেকে মুক্ত। সে পানাহারের ব্যাপারে হালাল ও হারামের সব বিধি-নিষেধ তুলে দিলো। সে খাতনার নির্দেশও বাতিল করে দিল অ-ইহুদীদের কাছে যা বিশেষভাবে অপছন্দনীয় ছিল। এমন কি সে 'মাসীহর' খোদায়ী, খোদার বেটা হওয়া এবং সমস্ত আদম সন্তানের জন্মগত পাপের কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শূলিবিদ্ধ হয়ে জীবন দেয়ার আকীদা-বিশ্বাসও গড়ে নিল। কারণ তা সাধারণভাবে সমস্ত মুশরিকের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত ঈসার (আ) প্রথম যুগের অনুসারীগণ এসব বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কিন্তু সেন্টপল যে দরজা খুলে দিয়েছিল তা দিয়ে অ-ইহুদী খৃষ্টানদের এক বিরাট সয়লাব এ ধর্মে ঢুকে পড়লো যার মোকাবেলায় ঐ নগণ্য সংখ্যক লোকগুলো কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও তৃতীয় খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্তও এমন বহুলোক ছিলো যারা হযরত ঈসার খোদা হওয়ার আকীদা অস্বীকার করতো। কিন্তু চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (৩২৫ খৃঃ) নিকিয়ার (Nicaca) কাউন্সিল পল প্রবর্তিত আকীদা-বিশ্বাসকে খৃষ্টানদের সর্বসম্মত ধর্ম হিসেবে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে। অতপর রোমান সাম্রাজ্য খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং কাইজার থিওডোসিয়াসের সময় খৃষ্ট ধর্মই সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যেসব গ্রন্থ এ আকীদার পরিপন্থী তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে এবং কেবল সেই সব গ্রন্থরাজি নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হবে যা এই আকীদার সাথে সংগতিপূর্ণ। ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে এথানাসিয়াসের (Athanasius) এক পত্রের দ্বারা প্রথমবারের মত স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজির একটি ঘোষণা দেয়া হয়। পরে ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ ডেমাসিয়াসের (Damasius) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন তা অনুমোদন করে এবং পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে পোপ গেলাসিয়াস (Gelasius) এই গ্রন্থসমষ্টিকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যাখাত গ্রন্থরাজির একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন। অথচ পল প্রবর্তিত যেসব আকীদা-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেসব আকীদা-বিশ্বাসের কোন একটিও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে খৃষ্টান পাদরী-পুরোহিতদের কেউ কখনো দাবী করতে পারেননি। বরং

যে সুসমাচারগুলো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত তার মধ্যেও হযরত ঈসার (আ) কোন বাণী থেকে ঐ সব আকায়েদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এসব অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচারকে অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো তা সরকারীভাবে গৃহীত খৃষ্টবাদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে এর রচয়িতা গ্রন্থের শুরুতে বলছেন ঃ যেসব লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে। খাতনা করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং হারাম খাদ্যকে হালাল করে দেয় তাদের ধ্যান-ধারণা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পলও এসব প্রতারিতদের একজন। তিনি বলছেন ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁর মু'জিযাসমূহ দেখে মুশরিক রোমান সৈন্যরা সর্বপ্রথম তাঁকে খোদা এবং কেউ কেউ খোদার পুত্র বলতে শুরু করে। অতপর বনী ইসরাঈলদের সর্বসাধারণের মধ্যেও এই ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ভ্রান্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যারা তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতো তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। অতপর এই আকীদার প্রতিবাদের জন্য তিনি তাঁর শাগরেদদের সমগ্র ইয়াহুদিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন এবং যার থেকে এসব মু'জিযা প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে 'খোদা অথবা খোদার পুত্র' মনে করার ভ্রান্ত ও উদ্ভট ধারণা থেকে মানুষ যাতে বিরত থাকে সে জন্য যেসব মু'জিযা তাঁর নিজের থেকে প্রকাশ পেতো তাঁর দোয়ায় শাগরেদদের থেকেও সেসব মু'জিযা প্রকাশ করা হলো। এ ব্যাপারে তিনি হযরত ঈসার (আ) বক্তৃতাসমূহ বিস্তারিত উদ্ধৃতি করেছেন যাতে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করেছিলেন। আর এই গোমরাহী প্রসার লাভ করায় হযরত ঈসা (আ) কতটা বিচলিত ছিলেন, তাও তিনি এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বার্নাবাস পলের গড়া এ আকীদাও খন্ডন করেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তিনি নিজ চোখে দেখা যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাহলো, যে সময় ইয়াহুদা ইহুদী পুরোহিতদের নেতার নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করানোর জন্য সৈন্যদের নিয়ে আসলো তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে চারজন ফেরেশতা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন এবং ইয়াহুদা ইসকার ইউতির আকৃতি ও কন্ঠ অবিকল হযরত ঈসার আকৃতি ও কন্ঠের মত করে দেয়া হলো। তাকেই শূলি বিদ্ধ করা হয়েছে, হযরত ঈসাকে (আ) নয়। এভাবে এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পলের গড়া খৃষ্টান ধর্মের মূল উটপাটিত করে ফেলেছে এবং কুরআনের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। অথচ এসব বক্তব্যের কারণেই কুরআন নাযিলের ১১৫ বছর আগে খৃষ্টান পাদরীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এগার ঃ এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বার্নাবাসের ইনজিল বা সুসমাচার প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের চারটি সুমাচার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য সুসমাচার। এ গ্রন্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা, জীবন-চরিত এবং বাণীসমূহ সঠিকভাবে তুলে ধরে। এটা খৃষ্টানদের দুর্ভাগ্য যে, এ গ্রন্থের সাহায্যে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস শুধরে নেয়া এবং হযরত ঈসার (আ) মূল শিক্ষাসমূহ জানার যে সুযোগ তারা লাভ করেছিল শুধু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা থেকে তারা বঞ্চিত থেকে গেল। বার্নাবাস হযরত ঈসা (আ) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন এখন তা আমরা দ্বিধাহীনভাবে এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। এসব সুসংবাদের কোনটিতে

হযরত ঈসা (আ) নবীর (সা) নাম উল্লেখ করেছেন, কোনটিতে 'রসূলুল্লাহ' বলেছেন, কোনটিতে তাঁর জন্য 'মাসীহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোনটিতে 'প্রশংসার যোগ্য' (Admirable) বলেছেন, আবার কোনটিতে স্পষ্টভাবে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা হুবহু لا اله الا الله محمد رسول الله এর সমার্থক। এখানে সবগুলো সুসংবাদবাণী উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা এত অধিক সংখ্যক এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে পূর্বাপর প্রসংগে এসেছে যে তার সমন্বয়ে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থই তৈরী হতে পারে। আমরা তার মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে এখানে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করছি ঃ

"সমস্ত নবী—যাঁদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার—অস্পষ্টভঙ্গিতে কথা বলেছেন। কিন্তু আমার পরে সমস্ত নবী এবং পবিত্র সত্তাসমূহের জ্যোতি আসবেন যিনি নবীদের বলা কথার অন্ধকার দিকের ওপর আলোকপাত করবেন। কারণ তিনি খোদার রাসূল।" (অধ্যায়—১৭)

"ফরিশী এবং লাবীরা বললো ঃ যদি তুমি মাসীহও না হয়ে থাকো, ইলিয়াসও না হয়ে থাকো কিংবা অন্য কোন নবীও না হয়ে থাকো তাহলে তুমি নতুন শিক্ষা দিচ্ছ কেন এবং নিজেকে মাসীহর চেয়ে বড় করেই বা পেশ করছো কেন? জবাবে ঈসা বললেন ঃ আমার দ্বারা আল্লাহ যেসব মু'জিযা দেখান তা প্রকাশ করে যে, আমি তাই বলি যা খোদা চান। অন্যথায় তোমরা যার কথা বলে থাকো, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে তার সেই (মাসীহ) চেয়ে বড় করে পেশ করার যোগ্য নই। যাকে তোমরা মাসীহ বলে থাকো আমি তো খোদার সেই রসূলের মোজার গিরা বা তাঁর জুতার ফিতা খোলারও উপযুক্ত নই, যাঁকে আমার আগে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, আমার পরে আসবেন এবং সত্যের বাণী নিয়ে আসবেন, যাতে তাঁর দীনের কোন সীমাবদ্ধতা না থাকে।" (অধ্যায়—৪২)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের বলছি, যেসব নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই কেবল একটি মাত্র কওমের জন্য খোদার নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাই যেসব লোকের জন্য তাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ছাড়া সেই সব নবীর বাণী আর কোথাও প্রচারিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন আসবেন, খোদা হয়তো তাঁকে নিজের হাতের মোহর দিয়ে পাঠাবেন এমনকি দুনিয়ার যেসব কওম তাঁর শিক্ষা লাভ করবে তাদেরকেই তিনি মুক্তি ও রহমত পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি খোদাহীন লোকদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে আসবেন এবং এমনভাবে মূর্তি পূজার মূলোৎপাটন করবেন যে, শয়তান অস্থির হয়ে উঠবে।"

"এরপর শাগরেদদের সাথে দীর্ঘ কথাবার্তার সময় হযরত ঈসা (আ) স্পষ্ট করে একথা বলেন যে, সেই নবী হবেন বনী ইসমাঈল বংশের লোক।" (অধ্যায়—৪৩)

"এ জন্য আমি তোমাদের বলি যে, খোদার রসূল এমন এক দীপ্তি ও সৌন্দর্য যার দ্বারা খোদা তা'আলার সৃষ্ট প্রায় সব বস্তুই আনন্দিত হবে। কেননা, তিনি উপলব্ধি ও উপদেশ, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি, ভয় ও ভালবাসা এবং দূরদর্শিতা ও পরহেযগারীর প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত। তিনি বদান্যতা ও দয়ামায়া, ন্যায়নিষ্ঠতা ও তাকওয়া এবং শিষ্টাচার ও ধৈর্যের প্রাণসত্তা দ্বারা গুণান্বিত। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাদের এই প্রাণসত্তা দান করেছেন তিনি তাদের তুলনায় তা তিনগুণ লাভ করেছেন। যে সময় তিনি দুনিয়ায় আসবেন সে সময়টা কত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় হবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করো, যেমনটি প্রত্যেক নবী তাঁকে

দেখেছেন তেমনি আমিও তাঁকে দেখেছি এবং সম্মান দেখিয়েছি। তাঁর রূহকে দেখেই আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দিয়েছেন। আর আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন আমার প্রাণ একথা বলতে গিয়ে পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠলো যে, হে মুহাম্মাদ, খোদা তোমার সাথে থাকুন এবং তিনি যেন আমাকে তোমার জুতার ফিতা বেঁধে দেয়ার যোগ্য বানিয়ে দেন। কারণ, এই মর্যাদাটুকু পেলেও আমি একজন বড় নবী এবং খোদার এক পবিত্র সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবো।" (অধ্যায়—৪৪)

"(আমার চলে যাওয়ার কারণে) তোমাদের মন যেন বিচলিত না হয় এবং তোমরা ভয় না পাও। কারণ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করি নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্রষ্টা, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। বাকী রহিল আমার কথা। আমি এ সময় দুনিয়ায় এসেছি আল্লাহর সেই রাসূলের জন্য পথ পরিষ্কার করতে যিনি দুনিয়ার জন্য মুক্তি নিয়ে আসবেন..........ইন্দারিয়াস বললো ঃ হে মহান শিক্ষক, আমরা যাতে তাঁকে চিনতে পারি সে জন্য আপনি তাঁর কিছু নিদর্শন বলে দিন। ঈসা জবাব দিলেন ঃ তিনি তোমাদের যুগে আসবেন না, বরং তোমাদের বহু বছর পরে আসবেন যখন আমার 'ইনযিল' এতটা বিকৃত হয়ে যাবে যে, বড় জোর ত্রিশজন ঈমানদার অবশিষ্ট থাকবে। তখন আল্লাহ দুনিয়ার ওপরে অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর রাসূলকে পাঠাবেন। তাঁর মাথার ওপর সাদা মেঘ ছায়া দান করবে। তিনি যে, আল্লাহর মনোনীত তা এভাবে জানা যাবে এবং তাঁর দ্বারা দুনিয়া খোদার পরিচয় জানতে পারবে। খোদাহীনদের বিরুদ্ধে তিনি বিরাট শক্তি নিয়ে আসবেন এবং পৃথিবী থেকে মূর্তিপূজা উচ্ছেদ করবেন। তাঁর জন্য আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, তাঁর মাধ্যমে আমাদের খোদাকে চেনা যাবে, তাঁর পবিত্রতা প্রমাণিত হবে এবং সারা দুনিয়া আমার সত্যতা জানতে পারবে। আর তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন যারা আমাকে মানুষের চেয়ে বড় কিছু সাব্যস্ত করবে..........তিনি এমন একটি সত্য নিয়ে আসবেন যা সমস্ত নবী কর্তৃক আনীত সত্যের চেয়ে অধিক স্পষ্ট হবে।" (অধ্যায়—৭২)

"খোদার প্রতিশ্রুতি এসেছিল, যেরুশালেমে সুলায়মানের উপাশনালয়ের মধ্যে অন্য কথাও নয়। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, এমন এক সময় আসবে, যখন খোদা অন্য এক শহরে তাঁর রহমত নাযিল করবেন। অতপর সব জায়গায় সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত বন্দেগী হতে পারবে। আর আল্লাহ তাঁর রহমতে সব জায়গায় সঠিক ও সত্যিকার নামায কবুল করবেন..........আমি প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলের পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণকারী নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমার পরে সারা দুনিয়ার জন্য খোদার প্রেরিত সেই মাসীহ আসবেন যার জন্য আল্লাহ সারা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী হবে এবং তাঁর রহমত নাযিল হবে।" (অধ্যায়—৮৩)

"(ঈসা পুরোহিত সর্দারকে বললেন ঃ) জীবন্ত সেই খোদার শপথ, যাঁর জন্য আমার প্রাণ নিবেদিত। সারা বিশ্বের জাতিসমূহ যে মাসীহর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে, আমাদের পিতা ইবরাহীমকে (আ) আল্লাহ যাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, সে মাসীহ তো আমি নই।"

(আদিপুস্তক ঃ অধ্যায় ঃ ২২ পদ—১৮)

"কিন্তু খোদা যখন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন তখন শয়তান পুনরায় এভাবে বিদ্রোহ ছড়াবে যাতে খোদাকে যারা ভয় করে না তারা আমাকে খোদা এবং খোদার বেটা হিসেবে মেনে নেয়। তার কারণে আমার বাণী এবং শিক্ষা বিকৃত করে ফেলা হবে, এমনকি বড়জোর ত্রিশ জন ঈমানদার লোক অবশিষ্ট থাকবে। সেই সময় খোদা দুনিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর সেই রসূলকে পাঠাবেন যাঁর জন্য তিনি দুনিয়ার এই সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যিনি শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দক্ষিণ থেকে আসবেন এবং মূর্তিসমূহকে মূর্তির পূজারীদের সহ ধ্বংস করে ফেলবেন। শয়তান মানুষের ওপর যে কর্তৃত্ব লাভ করেছে তিনি তার থেকে সে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন। যারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে তাদের মুক্তির জন্য তিনি খোদার রহমত নিয়ে আসবেন। আর বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী তারা যারা তাঁর কথা মানবে।" (অধ্যায়—৯৬)

"পুরোহিত সদার জিজ্ঞেস করলো ঃ খোদার সেই রাসূলের পরে অন্য কোন নবী কি আসবেন? ঈসা জবাব দিলেন ঃ তাঁর পরে খোদার প্রেরিত আর কোন সত্য নবী আসবেন না। কিন্তু অনেক মিথ্যা নবী আসবে যে কারণে আমি দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন। কেননা খোদার ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার কারণে শয়তান তাদের আবির্ভাব ঘটাবে। তারা আমার এই ইনযীলের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে।" (অধ্যায়—৯৭)

পুরোহিত সরদার জিজ্ঞেস করলো ঃ সে মাসীহকে কোন্ নামে ডাকা হবে এবং কি কি নিদর্শন তাঁর আগমনকে প্রকাশ করবে? ঈসা জবাব দিলেন ঃ সেই মাসীহর নাম 'প্রশংসা যোগ্য'। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন নিজেই তার এ নাম রেখেছিলেন এবং সেখানে তাঁকে ফেরেস্তাদের মত মর্যাদায় রাখা হয়েছিলো। খোদা বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ, অপেক্ষা কর। কেননা, তোমার কারণেই আমি জান্নাত, পৃথিবী এবং আরো অনেক 'মাখলুক' সৃষ্টি করবো। আর তা সব উপহার হিসেবে তোমাকে দেব। এমন কি যে তোমাকে মোবারকবাদ দেবে, তাকেও কল্যাণ দান করা হবে এবং যে তোমাকে অভিসম্পাত করবে তাকে অভিসম্পাত দেয়া হবে। যে সময় আমি তোমাকে দুনিয়ায় পাঠাবো তখন মুক্তির সংবাদ বাহক হিসেবে পাঠাবো। তোমার কথা হবে সত্য। আসমান ও যমীন স্থানচ্যুত হবে কিন্তু তোমার দীন টলবে না। তাই তাঁর পবিত্র ও কল্যাণময় নাম 'মুহাম্মাদ' (স)।" (অধ্যায়—৯৭)

বার্নাবাস লিখছেন ঃ এক সময়ে হযরত ঈসা (আ) তাঁর শাগরিদদের সামনে বললেন ঃ আমার শাগরিদদেরই একজন (পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ইয়াহুদা ইসকার ইউতি সেই শাগরিদ) ৩০টি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দেবে। তারপরে বললেন ঃ

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাকে বিক্রি করবে এরপর সে-ই আমার নামে মারা যাবে। কেননা, খোদা আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে উঠিয়ে নেবেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেবেন যে, সবাই মনে করবে সে-ই আমি। তথাপি সে যখন জঘন্য মৃত্যুবরণ করবে তখন একটা সময়-কাল পর্যন্ত লাঞ্ছনা আমারই হতে থাকবে। কিন্তু খোদার পবিত্র রাসূল মুহাম্মাদ যখন আসবেন তখন সেই বদনাম দূর করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তা এ জন্য করবেন যে, আমি সেই মাসীহর সত্যতা স্বীকার

করেছি। সেজন্য তিনি আমাকে এই পুরস্কার দেবেন। লোকে জানতে পারবে আমি বেঁচে আছি এবং সেই লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (অধ্যায়—১১৩)

"(হযরত ঈসা শাগরিদদের বললেন ঃ) আমি সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের বলছি, যদি মূসার গ্রন্থের সত্যতা বিকৃত করা না হতো তাহলে খোদা আমাদের পিতা দাউদকে অন্য একখানি গ্রন্থ দিতেন না। আর দাউদের গ্রন্থের মধ্যে যদি বিকৃতি ঘটানো না হতো তাহলে খোদা আমাকে ইনযিল দিতেন না। কারণ, মহাপ্রভু আমাদের খোদা পরিবর্তিত হওয়ার নন। আর তিনি সব মানুষকে একই বাণী দিয়েছেন। তাই যখন আল্লাহর রাসূল আসবেন এ সব জিনিসকে পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যই আসবেন যা দিয়ে খোদাহীন লোকেরা আমার কিতাবকে কলুষিত করে ফেলেছে।" (অধ্যায়—১২৪)

এসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণীতে শুধু তিনটি বিষয় এমন দেখা যায় যা আপাতঃ দৃষ্টিতে খটকা লাগায়। এক, এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং বার্নাবাসের ইনজীলের আরো কিছু বাক্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের মাসীহ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। দুই, শুধু ওপরে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে নয় বরং এ সুসমাচারের বহুস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল আরবী নাম 'মুহাম্মাদ' লেখা হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে আসবেন এমন কোন পবিত্র ব্যক্তি ও সত্তার মূল নাম উল্লেখ করা নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ নিয়ম বা রীতি নয়। তিন, এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'মাসীহ' বলা হয়েছে।

প্রথম সন্দেহের জবাব হলো, শুধু বার্নাবাসের সুসমাচারেই নয়, বরং লূক লিখিত সুসমাচারেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে 'মাসীহ' বলতে তাঁর শাগরিদদের নিষেধ করেছিলেন। লূকের ভাষা হলো ঃ "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন ও আদেশ করিলেন, একথা কাহাকেও বলিও না।" (অধ্যায়—৯ পদ—২১ ও ২২) সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি যে মাসীহর আগমনের অপেক্ষায় ছিল তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, তিনি তরবারির জোরে ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের পরাজিত করবেন।' তাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি সেই 'মাসীহ' নই। তিনি আমার পরে আসবেন।

দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব হলো, বার্নাবাসের সুসমাচারের যে ইটালিয়ান অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদ' লিখিত আছে। কিন্তু একথা কেউ–ই জানে না যে, এ গ্রন্থ কোন্ কোন্ ভাষার অনুবাদের অনুবাদ হয়ে অবশেষে ইটালিয়ান ভাষায় পৌঁছেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, বার্নাবাসের মূল সুসমাচার গ্রন্থখানা সুরিয়ানী ভাষায়ই হওয়ার কথা। কারণ হযরত ঈসা (আ) এবং তার অনুসারীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সেই মূল গ্রন্থখানা পাওয়া গেলে জানা যেতো, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম কি লেখা হয়েছিলো। এখন যতটুকু অনুমান করা যায় তা হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হয়তো মূল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন "مُنْحَمَنَّا" (মুনহামান্না) যোহন লিখিত সুসমাচারের বরাত দিয়ে ইবনে ইসহাক যা বর্ণনা করেছেন। অতপর অনুবাদকারীরা হয়তো নিজ নিজ ভাষায় তার অনুবাদ করেছেন। এরপর কোন অনুবাদক হয়তো মনে করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আগমনকারীর যে নাম বলা হয়েছে

তা পুরোপুরি 'মুহাম্মাদ' শব্দের সমার্থক। তাই তিনি নবীর (সা) পবিত্র এই নামটিই লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ নামটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকাই এরূপ সন্দেহ পোষণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় যে, বার্নাবাসের গোটা সুসমাচারটাই কোন মুসলমানের নকল রচনা।

তৃতীয় সন্দেহের জবাব হলো, 'মাসীহ' শব্দটি মূলত একটি ইসরাঈলী পরিভাষা। কুরআন মজীদে কেবল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য এই পরিভাষাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ইহুদীরা তাঁর 'মাসীহ' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতো। মূলত এটি কুরআন মজীদের কোন পরিভাষা নয়। আর কুরআন মজীদের কথাও এটিকে ইসরাঈলীদের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারও করা হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যদি 'মাসীহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন আর কুরআনে তাঁর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার না করা হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, বার্নাবাসের সুসমাচার তাঁর সাথে এমন কিছু সম্পর্কিত করছে যা কুরআন অস্বীকার করে। আসলে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটা প্রথা চলে আসছিলো। প্রথমটি হলো, কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তিকে যখন কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হতো তখন সেই বস্তু বা ব্যক্তির মাথার ওপর তেল মেখে দিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা হতো। ইবরানী (হিব্রিয়) ভাষায় তেল মাখার এই কাজকে "মাস্‌হ" বলা হতো। আর যে বস্তু বা ব্যক্তির ওপর তা মেখে দেয়া হতো তাকে 'মাসীহ' বলা হতো। উপাসনালয়ের পাত্রসমূহ এভাবে মুছে বা মর্দন করে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো। যাজক ও পুরোহিতদের পৌরহিত্যের (Priesthood) আসনে সমাসীন করার সময়ও 'মাস্‌হ' করা হতো। বাদশাহ এবং নবীকেও যখন খোদার তরফ থেকে বাদশাহী বা নবুওয়াতের জন্য নিয়োগ করা হতো তখন 'মাসহ্' করা হতো। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা মতে বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসে বহু 'মাসীহ'র সন্ধান পাওয়া যায়। পুরোহিত হিসেবে হযরত হারুন 'মাসীহ' ছিলেন। হযরত মূসা যাজক এবং নবী হিসেবে, তালূত বাদশাহ হিসেবে, হযরত দাউদ বাদশাহ এবং নবী হিসেবে, মালকে সাদাক বাদশাহ এবং যাজক হিসেবে এবং হযরত "আল–ইয়াসা" নবী হিসেবে "মাসীহ" ছিলেন। পরবর্তীকালে কাউকে তেল মেখে দিয়ে নিবেদিত করার প্রয়োজনও ছিল না। বরং আল্লাহর তরফ থেকে কারো আদিষ্ট হওয়াই 'মাসীহ' হওয়ার সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে রাজাবলী–১ এর ১৯ অধ্যায় দেখুন। এতে বলা হয়েছে যে, খোদা হযরত ইলিয়াসকে (এলিয়) আদেশ করলেন, তুমি ইসরায়েলকে 'মাসহ' কর, সে আরামের (দামেশক) বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত হোক এবং নিমশির পুত্র যেহুকে ইসরাঈলের উপরে রাজপদে অভিষেক কর। আর তোমার স্থলাভিষিক্ত নবী হওয়ার জন্য ইলীশায়কে (আল ইয়াসা) অভিষেক কর। তাঁদের কারো মাথায়ই তেল মর্দন করা হয়নি। খোদার পক্ষ থেকে তাঁর আদিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়াই যেন তাঁকে 'মাসাহ' বা অভিষিক্ত করার শামিল ছিল। অতএব, ইসরাঈলী ধ্যান–ধারণা অনুসারে 'মাসীহ' শব্দটি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সমার্থক ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। (ইসরাঈলীদের দৃষ্টিতে "মাসীহ" শব্দটির অর্থ কি তা বুঝার জন্য দেখুন ঃ সাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ "মিস্‌ইয়াহ")

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۞ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۞

সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে।[১০] অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহর আনুগত্য করার) দিকে আহবান করা হচ্ছে।[১১] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দেন না। এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।[১২] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।[১৩]

৯. মূল আয়াতে سحر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে سحر শব্দটি যাদু অর্থে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যাদু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার যেমন পরিচিত তেমনি ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহারও পরিচিত। যেমন ঃ আরবীতে বলা হয় سحره ای خدعه সে অমুক ব্যক্তিকে যাদু করেছে অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে। যে দৃষ্টি ও চাহনি মন কেড়ে নেয় তাকে বলা হয় عين ساحرة যাদুময়ী চোখ। যে প্রান্তরে চারদিকে কেবল মরীচিকা আর মরীচিকাই চোখে পড়ে তাকে ارض ساحرة (বা যাদুর প্রান্তর) বলে। রৌপ্যকে পালিশ করে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল করা হলে তাকে বলা হয় سحرت الفضة । সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন সেই নবী, যার আগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলেন তখন বনী ইসরাঈল এবং হযরত ঈসার উম্মাতগণ তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে খোলাখুলি প্রতারণা ও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করল।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করা এবং নবীর ওপর আল্লাহর যে বাণী নাযিল হচ্ছে তাকে নবীর নিজের তৈরী কথা বলে ধরে নেয়া।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর এই সত্য নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলাটাই কোন ছোট খাট জুলুম নয়। কিন্তু সেটা আরো বড় জুলুম হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আল্লাহর দাসত্ব ও

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের[১৪] সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের [১৫] প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান।[১৬] আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমনসব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।[১৭] আর আরেক জিনিস যা তোমরা আকাংখা করো আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়।[১৮] হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান করো।

আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান আর জবাবে শ্রোতা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ও অপবাদ আরোপের কৌশল অবলম্বন করে।

১২. স্মরণ রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি ৩ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল। সে সময় ইসলাম কেবল মদীনা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না এবং গোটা আরবভূমি দীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং আশেপাশের গোত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর

এই 'নূর' কারো নিভিয়ে দেয়াতে নিভবে না, বরং পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ক্ষান্ত হবে। এটা একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ভবিষ্যত কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই সময় আর কে তা জানতো? মানুষ তো তখন দিব্যি দেখছিল, এটা একটা নিভু নিভু প্রদীপ যা নিভিয়ে ফেলার জন্য প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩. 'মুশরিকদের জন্য অসহনীয় হলেও।' অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদের দাসত্বও করে থাকে এবং আল্লাহর দীনের সাথে অন্য সব দীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চায় না। যারা ইচ্ছামত যে কোন প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তামাদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপোষ করার জন্য আল্লাহর রসূলকে পাঠানো হয়নি। বরং তাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন তাকে গোটা জীবনের সব দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফের ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রসূলের এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো দু'টি স্থানে এ ঘোষণা এসেছে। এক, সূরা তাওবার ৩৩ আয়াতে। দুই, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াতে। এ স্থানে তৃতীয়বারের মত এ ঘোষণার পুনরুক্তি করা হচ্ছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, টীকা ৩২; সূরা আল ফাত্হ, টীকা ৫১।)

১৪. ব্যবসায় এমন জিনিস যাতে মানুষ তার অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা অর্জনের জন্য। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করলে সেই মুনাফা তুমি অর্জন করতে পারবে যার কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্য এক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে ঃ (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত্ তাওবা, টীকা ১০৬)।

১৫. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যখন বলা হয় ঈমান আনো তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও। ঈমানের মৌখিক দাবীই শুধু করো না, বরং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ এ ব্যবসায় তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী উত্তম।

১৭. এটা সেই ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে এই মুনাফাই অর্জিত হবে। এক, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। দুই, গোনাহসমূহ মাফ হওয়া। তিন, আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ করা যার নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

১৮. যদিও পৃথিবীতে বিজয় ও সফলতা লাভ করাও একটা বড় নিয়ামত। কিন্তু মু'মিনের নিকট প্রকৃত গুরুত্বের বিষয় এ পৃথিবীর সফলতা নয়, বরং আখেরাতের

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَـٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের[১৯] উদ্দেশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলো ঃ আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী।[২০] সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতপর আমি ঈমান আনয়নকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।[২১]

সফলতা। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে শুভ ফলাফল অর্জিত হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে আর আখেরাতে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সংগীদের জন্য বাইবেলে সাধারণত 'শিষ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যে তাদের জন্য রসূল (Apostles) পরিভাষাটি চালু হয়। তবে তারা আল্লাহর রসূল ছিল এ অর্থে তাদেরকে রসূল বলা হতো না, বরং তাদেরকে রসূল বলা হতো এ অর্থে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠাতেন। যেসব লোককে হাইকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো তাদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে এর পরিবর্তে হাওয়ারী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এ দু'টি খৃষ্টীয় পরিভাষা থেকে উত্তম। এ শব্দটির মূল হলো حور যার অর্থ শুভ্রতা। ধোপাকে حوارى (হাওয়ারী) বলা হয় এ জন্য যে, সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়। খাঁটি ও নিখাদ জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়। চালুনি দিয়ে চেলে যে আটার ভূষি ও ছাল বের করে আলাদা করা হয়েছে তাকে حوارى (হুওয়ারা) বলে। এ অর্থে অকৃত্রিম বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইবনে সাইয়েদ বলেন ঃ যেসব ব্যক্তি কাউকে অধিক মাত্রায় সাহায্য করে তাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলে। (লিসানুল আরব)

২০. যারা আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান জানায় এবং কুফরের মোকাবিলায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা–সাধনা করে কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে এটি তার মধ্যে সর্বশেষ জায়গা। ইতিপূর্বে

সূরা আলে ইমরানের ৫২ আয়াত, সূরা হাজ্জের ৪০ আয়াত, সূরা মুহাম্মাদের ৭ আয়াত, সূরা হাদীদের ২৫ আয়াত এবং সূরা হাশরের ৮ আয়াতে এই একই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৫০নং টীকা, সূরা হজ্জের ৮৪নং টীকা, সূরা মুহাম্মাদের ১২নং টীকা এবং সূরা হাদীদের ৪৭নং টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যা পেশ করেছি। তাছাড়া সূরা মুহাম্মাদের ৯নং টীকায়ও এ বিষয়টির একটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত সৃষ্টির কারো উপরই নির্ভরশীল নন, কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী তখন তাঁর কোন বান্দা কেমন করে তাঁর সাহায্যকারী হতে পারে? এই খটকা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য আমরা বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা এখানে পেশ করছি।

এসব লোককে আল্লাহর সাহায্যকারী মূলত এজন্য বলা হয়নি যে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের যে গণ্ডিতে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও নাফরমানীর যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অজেয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে মানুষকে মু'মিন ও অনুগত বানান না। বরং নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে উপদেশ দেন, শিক্ষাদান করেন এবং বুঝিয়েসুজিয়ে সঠিক পথ দেখানোর পন্থা অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি এই উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করে সে মু'মিন; যে কাজে পরিণত করে সে মুসলিম, অনুগত ও আবেদ; যে আল্লাহভীতির নীতি অনুসরণ করে সে মুত্তাকী, যে নেকীর কাজে অগ্রগামী হয় সে 'মুহ্সিন' এবং এর থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যে এই উপদেশ ও শিক্ষার সাহায্যে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং কুফর ও পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েম করার জন্য কাজ করতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর সাহায্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন। যেমন উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি স্থানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটিই বলা হয়েছে। যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না বলে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী বলা মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে انصار الله না বলে انصار دين الله বলা হতো, ينصرون الله না বলে ينصرون دين الله বলা হতো এবং ان تنصروا الله না বলে ان تنصروا دين الله বলা হতো। একটি বিষয় বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন কয়েকটি স্থানে একের পর এক একই বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন তখন তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের লোকদের আল্লাহর সাহায্যকারী বলাই এর মূল উদ্দেশ্য। তবে এই সাহায্য নাউযুবিল্লাহ এ অর্থে নয় যে, এসব লোক আল্লাহ তা'আলার এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছে যার তিনি মুখাপেক্ষী। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ তাঁর জবরদস্ত শক্তির জোরে না করে তাঁর নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে করতে চান এসব লোক সেই কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২১. ঈসা মাসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বলতে ইহুদী এবং ঈমান গ্রহণকারী বলতে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়কে বুঝানো হয়েছে আর এই দুই জাতিকেই আল্লাহ তা'আলা ঈসা মাসীহর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। এখানে

একথাটি বলার উদ্দেশ্য মুসলমানদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া যে, হযরত ঈসার অনুসারীরা ইতিপূর্বেও যেভাবে তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন এখনও তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন।